بسم الله الرحمن الرحيم

লন্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২৯ মার্চ, ২০১৯ মোতাবেক ২৯ আমান, ১৩৯৮ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

আজ যেসব বদরী সাহাবীর স্মৃতিচারণ করব তাদের মাঝে সর্বপ্রথম স্মৃতিচারণ করা হবে, হযরত তুলায়েব বিন উমায়ের (রা.)'র। তার ডাকনাম ছিল আবু আদী। তার মায়ের নাম ছিল আরওয়া, যিনি আব্দুল মুত্তালিবের কন্যা এবং মহানবী (সা.) এর ফুপু ছিলেন। যেমনটি আমি বলেছি, তার ডাকনাম ছিল আবু আদী। তিনি প্রারম্ভিক যুগে ইসলাম গ্রহণকারীদের একজন ছিলেন। মহানবী (সা.)-এর দ্বারে আরকামে অবস্থানকালে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। **{উসদুল গাবাহ্, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৯৩, তুলায়েব বিন উমায়ের (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত}**

আবু সালামাহ্ বিন আব্দুর রহমান (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত তুলায়েব বিন উমায়ের (রা.) দ্বারে আরকামে ঈমান এনেছিলেন। এরপর সেখান থেকে বেরিয়ে তিনি তার মায়ের কাছে যান এবং তাকে বলেন, আমি মুহাম্মদ (সা.)-এর আনুগত্য বরণ করেছি এবং বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহ্র সত্তায় ঈমান এনেছি। তার মা বলেন, তোমার মামার পুত্র অর্থাৎ মহানবী (সা.)'ই তোমাকে সাহায্য এবং সহযোগিতার সবচেয়ে বেশি অধিকার রাখেন। অর্থাৎ তিনি সমর্থন করে (বলেন), তুমি ঈমান এনে খুব ভালো করেছ। এরপর বলেন, খোদার কসম! যদি আমাদের মহিলাদের মধ্যেও পুরুষদের মতো শক্তি থাকতো তাহলে আমরাও অবশ্যই তাঁর (সা.) আনুগত্য করতাম এবং তাঁর সাহায্য-সমর্থন ও প্রতিরক্ষা করতাম। হযরত তুলায়েব (রা.) তার মা-কে বলেন, তাহলে আপনি ইসলাম গ্রহণ করে মহানবী (সা.)-এর অনুসরণ করছেন না কেন? এই ছিল তার ঈমানী চেতনা ও প্রেরণা। তিনি বলেন, আপনার ভাই হামযাও তো মুসলমান হয়ে গেছেন। তিনি বলেন, আমি আমার বোনদের প্রতিক্রিয়া দেখি, এরপর আমিও তাদের (অর্থাৎ ঈমান আনয়নকারীদের) অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। হযরত তুলায়েব (রা.) বলেন, আমি আল্লাহ্র দোহাই দিয়ে আপনাকে বলছি, আপনি মহানবী (সা.)-এর সমীপে যান এবং তাকে সালাম করুন আর তাঁর সত্যায়ন করুন। আর সাক্ষ্য দিন, আল্লাহ্ ছাড়া কেউ ইবাদতের যোগ্য নয় এবং মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহ্র রসূল। তখন তার মা বলেন, আমিও সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্ ছাড়া কেউ ইবাদতের যোগ্য নয় আর মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহ্র রসূল। এরপর নিজের কথার মাধ্যমেও তিনি মহানবী (সা.)-এর সমর্থন করতেন আর ছেলেকেও মহানবী (সা.)-কে সাহায্য করা এবং তাঁর আনুগত্য করার উপদেশ দিতেন। **{আল্ মুসতাদরেক আলাস্ সহীহাঈন, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৬৬, কিতাব মা'রেফাতুস সাহাবাহ্ যিকরে মানাকেব তুলায়েব বিন উমায়ের (রা.), হাদীস নং: ৫০৪৭, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০২ সালে প্রকাশিত}**

তার সম্পর্কে বলা হয়, তিনি সেই ব্যক্তি যিনি ইসলামে সর্বপ্রথম মহানবী (সা.)-এর অবমাননার দায়ে কোন মুশরিককে আহত করেছিলেন। এর বিস্তারিত বিবরণ হল, একবার অওফ বিন সাবরাহ্ সাহ্মী মহানবী (সা.) সম্পর্কে অপলাপ করছিল। হযরত তুলায়েব (রা.) উটের চোয়ালের হাড় দিয়ে আঘাত করে তাকে আহত করেন। কেউ তার মা আরওয়া'র

কাছে অভিযোগ করে, আপনি কি দেখছেন না, আপনার ছেলে কী করেছে? তিনি উত্তরে বলেন,

اِنَّ طُلَيْبًا نَصَرَ ابْنَ خَالِه
وَاسَاهُ فِىْ ذِىْ دَمِه وَمَالِه

অর্থাৎ তুলায়েব তার মামাতো ভাইকে সাহায্য করেছে। সে তার রক্ত এবং সম্পদ দ্বারা তাঁর প্রতি সহানুভূতি ব্যক্ত করেছে। কারো কারো মতে, তিনি যাকে মেরেছিলেন তার নাম ছিল আবু এহাব বিন আযীয দারমী। আবার কোন কোন বর্ণনা অনুসারে যে ব্যক্তিকে হযরত তুলায়েব (রা.) আহত করেছিলেন সে আবু লাহাব বা আবু জাহ্‌ল ছিল। এক বর্ণনা অনুসারে তার মায়ের কাছে যখন তার আক্রমন করা সম্পর্কে অভিযোগ করা হয় তিনি বলেন, তুলায়েবের জীবনের সর্বোত্তম দিন সেটি যেদিন সে তার মামাতো ভাই অর্থাৎ মহানবী (সা.)-এর নিরাপত্তাবিধান করবে, যিনি আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে সত্য সহ এসেছেন।

{আল্ ইসাবাহ্, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪৩৯, তুলায়েব বিন উমায়ের (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯৫ সালে প্রকাশিত}, {আল্ মুসতাদরাক আলাস্ সহীহাঈনে লিলহাকেম, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৫৭, কিতাব মা'রেফাতুস সাহাবাহ্ যিকরে আরওয়া বিনতে আব্দুল মুত্তালিব, হাদীস নংঃ ৬৮৬৮, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০২ সালে প্রকাশিত}

হযরত তুলায়েব (রা.) ইথিওপিয়ায় হিজরতকারী মুসলমানদের একজন ছিলেন। কিন্তু ইথিওপিয়ায় যখন কুরাইশদের মুসলমান হওয়ার গুজব ছড়িয়ে পড়ে তখন ইথিওপিয়া থেকে কতিপয় মুসলমান মক্কায় ফিরে আসেন। হযরত তুলায়েব (রা.)ও তাদের মাঝে ছিলেন। **{সীরাত ইবনে হিশাম, পৃঃ ১৬৯. যিকরু মা লাকির রসূলুল্লাহ্ (সা.) মিন ক্বওমিহী মিনাল আযা, বৈরুতের দ্বার ইবনে হাযম থেকে ২০০৯ সালে প্রকাশিত}**

যেমনটি পূর্বেও বর্ণনা করা হয়েছে, হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.)'র মতে কোন কোন ঐতিহাসিকের দৃষ্টিভঙ্গী হল, (শুধুমাত্র যারা এটি বলেছে তারা) সবাই নয়; মুহাজিরদের ইথিওপিয়া গমনের কিছুদিন পার না হতেই এই উড়ো খবর আসে যে, কুরাইশরা সবাই মুসলমান হয়ে গেছে আর মক্কা এখন সম্পূর্ণ নিরাপদ। এ কারণে কেউ কেউ চিন্তাভাবনা না করেই ফিরে আসেন। এরপর তারা জানতে পারেন, এই খবর মিথ্যা। এ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য আমি কয়েক সপ্তাহ পূর্বের খুতবায় বর্ণনা করেছি। যাহোক, তারা ফিরে এলে বাস্তবচিত্র অবগত হওয়া যায়। তখন তাদের কতক মক্কার নেতা বা সর্দারদের কাছে আশ্রয় গ্রহণ করে, আর কতক আবার ফিরে আসে, কেননা এই সংবাদ পুরোটাই মিথ্যা ছিল। এই গুজব কেন ছড়িয়েছিল তা আমি পূর্বেই বর্ণনা করেছি, তাই এখানে আর বর্ণনা করার প্রয়োজন নেই।

যাহোক, সাহাবীরা যেজন্য ফিরে গিয়েছিলেন তার কারণ হল, কুরাইশের অত্যাচার ও নির্যাতন প্রতিদিন-প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছিল। আর মুহাম্মদ (সা.)-এর নির্দেশে অন্যান্য মুসলমানরাও সঙ্গোপনে ধীরে ধীরে দু'একজন করে হিজরত করছিলেন। বলা হয়, ইথিওপিয়ায় হিজরতকারীদের সংখ্যা ১০১ পর্যন্ত পৌঁছে যায়, যাদের মাঝে ১৮জন মহিলাও ছিলেন, এমনকি মহানবী (সা.)-এর কাছে স্বল্পসংখ্যক মুসলমান রয়ে যান। ফিরে আসার পর মুসলমানরা যে পুনরায় ইথিওপিয়ায় হিজরত করেছিল এবং এরপরও যেসব মুসলমান হিজরত করেছে, ঐতিহাসিকরা এই হিজরতকেই ইথিওপিয়ার দ্বিতীয় হিজরত আখ্যায়িত করেন। **(হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এম, এ প্রণীত সীরাত খাতামান্ নবীঈন, পৃঃ ১৪৭-১৪৯ দ্রষ্টব্য)**

হযরত তুলায়েব (রা.) যখন মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় আসেন তখন তিনি আব্দুল্লাহ্ বিন সালমাহ্ আজলানী (রা.)'র গৃহে অবস্থান করেন। মহানবী (সা.) হযরত তুলায়েব এবং হযরত মুনযের বিন আমর (রা.)'র মাঝে ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপন করেন। হযরত তুলায়েব (রা.) বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি জ্যেষ্ঠ সাহাবীদের মাঝে গণ্য হন। তিনি আজনাদাইন এর যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেন যা ত্রয়োদশ হিজরীর জমাদিউল উলা মাসে সংঘটিত হয়েছিল। সেই যুদ্ধেই ৩৫ বছর বয়সে তিনি শাহাদতের অমিয় সুধা পান করেন। আজনাদাইন সিরিয়ার কোন একটি অঞ্চলের নাম যেখানে ত্রয়োদশ হিজরীতে মুসলমান এবং রোমানদের মাঝে যুদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু কারো কারো মতে তিনি (রা.) ইয়ারমূকের যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেছিলেন। **{আত্ তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৯১, তুলায়েব বিন উমায়ের (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত}, {উসদুল গাবাহ্, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৯৪, তুলায়েব বিন উমায়ের (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত}, (মু'জিমুল বুলদান, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১২৯, 'আজনাদ্াইন' বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে প্রকাশিত)**

পরবর্তী যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তার নাম হল, হযরত সালেম মওলা আবী হুযায়ফাহ্ (রা.)। তার ডাকনাম ছিল আবু আব্দুল্লাহ্ আর তার পিতার নাম ছিল মা'কেল। তিনি ইরানের ইসতাখার নিবাসী ছিলেন। তিনি জ্যেষ্ঠ সাহাবীদের মাঝে গণ্য হন। তিনি একজন মুহাজিরও ছিলেন। তিনি মহানবী (সা.)-এর পূর্বেই মদীনায় হিজরত করেছিলেন। মহানবী (সা.) হযরত সালেম এবং হযরত মু'আয বিন মায়েয (রা.)'র মাঝে ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপন করেন। **{উসদুল গাবাহ্, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৮২-৩৮৩, সালেম মওলা আবী হুযায়ফাহ্ (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত}**

হযরত সালেম (রা.) সুবায়তা বিনতে ইয়া'র এর ক্রীতদাস ছিলেন, যিনি ছিলেন হযরত আবু হুযায়ফা (রা.)'র স্ত্রী। হযরত সুবায়তা (রা.) হযরত সালেম (রা.)-কে **সায়েবাহ্** রীতির অধীনে মুক্তি দেন। সে যুগে ক্রীতদাস সংক্রান্ত প্রচলিত রীতি ছিল যে, কাউকে যদি মুক্তি দেয়া হয় আর সেই মুক্ত ক্রীতদাস যদি মারা যায় তাহলে তার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতো মুক্তিদাতা। **সায়েবাহ্** সেই দাসকে বলা হয় যার মালিক তাকে মুক্ত করে দেয় আর তাকে আল্লাহ্ তা'লার পথে ছেড়ে দেয়। এর অর্থ হল, এখন সেই দাসের মৃত্যুর পর তার সম্পত্তির ওপর মুক্তিদাতা ব্যক্তির কোন অধিকার নেই। হযরত সালেম (রা.)-কে হযরত আবু হুযায়ফাহ্ (রা.) পালক পুত্র হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। এরপর তিনি সালেম বিন আবী হুযায়ফাহ্ নামে অভিহিত হন। হযরত আবু হুযায়ফাহ্ (রা.) তার ভাতিজি ফাতেমা বিনতে ওয়ালীদকে তার সাথে বিয়ে দেন। **{আত্ তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৬৩, সালেম মওলা আবী হুযায়ফাহ্ (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত}, {আল্ মুসতাদরাক আলাস্ সহীহাঈন (অনুবাদ), ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৪৩৪, (টীকা), লাহোরের ইশতিয়াক আয়ে মুশতাক ট্রেন্টার থেকে ২০১২ সালে প্রকাশিত}**

বলা হয়, আল্লাহ্ তা'লা যখন এই আয়াত অবতীর্ণ করেন-

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (সূরা আল্ আহযাবঃ ০৬)

অনুবাদ, তোমাদের উচিত পালক সন্তানদেরকে তাদের পিতার নামে ডাকা, এটি আল্লাহ্র দৃষ্টিতে অধিক ন্যায়সঙ্গত কাজ, আর যদি তোমরা যদি না জানো যে, তাদের পিতা কে, তাহলেও তারা তোমাদের ধর্মীয় ভাই এবং ধর্মীয় বন্ধু। আর তোমরা পূর্বে ভুলবশত যা করেছ এর জন্য তোমাদের বিরুদ্ধে কোন পাপ বর্তাবে না, কিন্তু যে (অন্যায়) কাজ তোমরা

ইচ্ছাকৃতভাবে কর (তা শাস্তিযোগ্য) আর আল্লাহ্ তা'লা (প্রত্যেক তওবাকারীর প্রতি) অতীব ক্ষমাশীল এবং বারবার কৃপাকারী।

বলা হয়, এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর হযরত সালেম মওলা আবী হুযায়ফাহ্ (নামে) অভিহিত হন। প্রথমে তিনি আবু হুযায়ফাহ্র পুত্র আখ্যায়িত হতেন, কিন্তু পরে মুক্ত ক্রীতদাস বা বন্ধু আখ্যায়িত হন। মুহাম্মদ বিন জা'ফর (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত আবু হুযায়ফাহ্ (রা.) এবং হযরত সালেম মওলা আবী হুযায়ফাহ্ (রা.) যখন মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেন তখন তারা উভয়েই আব্বাদ বিন বিশর (রা.)'র বাড়িতে অবস্থান করেন। **{আত্ তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৬২, আবু হুযায়ফাহ্ বিন উতবাহ্ (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত}**

হযরত ইবনে উমর (রা.)'র কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, প্রাথমিক মুহাজিরগণ যখন মক্কা থেকে মদীনা আসেন, তখন তারা **কুবার** পাশে **উসবাহ্** নামক স্থানে অবস্থান করেন। হযরত সালেম (রা.) তাদের নামায পড়াতেন কেননা, তিনি তাদের সবার চেয়ে বেশি পবিত্র কুরআন জানতেন। **{আত্ তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৬৪, সালেম মওলা আবু হুযায়ফাহ্ (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত}**

মাসঊদ বিন হুনায়দাহ্ বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.)-এর সাথে আমরা যখন কুবায় অবস্থান করি, সেখানে একটি মসজিদ দেখি যেখানে সাহাবীরা বায়তুল মাকদাসমুখী হয়ে নামায পড়তেন আর হযরত আবু হুযায়ফাহ্ (রা.)'র মুক্ত ক্রীতদাস হযরত সালেম (রা.) তাদের নামায পড়াতেন। **(আত্ তাবাকাতুল কুবরা, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২৩৩, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত)**

হযরত সালেম (রা.) পবিত্র কুরআনের ক্বারী ছিলেন। তিনি সেই চারজন সাহাবীর একজন ছিলেন যাদের সম্পর্কে মহানবী (সা.) বলেছিলেন, **তাদের কাছ থেকে পবিত্র কুরআনের জ্ঞান অর্জন কর**। **{উসদুল গাবাহ্, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৮২, সালেম মওলা আবী হুযায়ফাহ্ (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত}**

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) লিখেন, জ্ঞান-গরিমার ক্ষেত্রেও কোন কোন মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাস অনেক বড় মর্যাদা লাভ করেছেন। অতএব আবু হুযায়ফাহ্ (রা.)'র মুক্ত দাস সালেম বিন মা'কেল বিশেষ আলেম সাহাবী হিসেবে গণ্য হতেন। মহানবী (সা.) পবিত্র কুরআন শেখার জন্য যে চারজন সাহাবীকে নিযুক্ত করেছিলেন, সালেম (রা.)ও তাদের একজন ছিলেন। **(হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এম, এ প্রণীত সীরাত খাতামান্ নবীঈন, পৃঃ ৩৯৯ দ্রষ্টব্য)**

ইতিহাসের আলোকে এ সম্পর্কে তিনি (রা.) আরো বলেন, হযরত সালেম বিন মা'কেল (রা.), যিনি আবু হুযায়ফাহ্ বিন উতবাহ্ (রা.)'র এক নগণ্য মুক্তিপ্রাপ্ত দাস ছিলেন, তিনি নিজের জ্ঞান-গরিমায় এত উন্নতি করেন যে, মহানবী (সা.) মুসলমানদের মধ্য থেকে যে চারজন সাহাবীকে কুরআন শেখানোর জন্য নিযুক্ত করেছিলেন আর এই বিষয়ে যাদেরকে তাঁর নায়েব হওয়ার যোগ্য মনে করতেন, সালেম (রা.)ও তাদের একজন ছিলেন। **(হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এম, এ প্রণীত সীরাত খাতামান্ নবীঈন, পৃঃ ৪০৩ দ্রষ্টব্য)**

এক বর্ণনা অনুসারে মহানবী (সা.) বলেছেন, এই চারজন সাহাবীর কাছ থেকে পবিত্র কুরআন শেখ, অর্থাৎ ১. আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রা.), ২. হযরত সালেম মওলা আবী হুযায়ফাহ্ (রা.), ৩. হযরত উবাই বিন কা'ব (রা.) এবং ৪. মু'আয বিন জাবাল (রা.)। **(সহীহ্ বুখারী, কিতাব ফাযায়েল আসহাবিন্ নবী (সা.), বাব মানাকেব সালেম মওলা আবী হুযায়ফাহ্ (রা.), হাদীস নংঃ ৩৭৫৮)**

এক বর্ণনায় এসেছে, একবার মহানবী (সা.)-এর কাছে আসতে হযরত আয়েশা (রা.)'র কিছুটা বিলম্ব হয়। মহানবী (সা.) দেরিতে আসার কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন,

একজন ক্বারী অত্যন্ত সুললিত কণ্ঠে কুরআন পাঠ করছিলেন, তার তিলাওয়াত শুনছিলাম, তাই বিলম্ব হয়েছে। মহানবী (সা.) চাদর গায়ে দিয়ে বাইরে এসে দেখেন, হযরত সালেম (রা.) তিলাওয়াত করছেন। তখন তিনি (সা.) বলেন, আমি আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞ যিনি আমার উম্মতে তোমার মতো ক্বারী সৃষ্টি করেছেন। **{উসদুল গাবাহ্, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৮৩, সালেম মওলা আবী হুযায়ফাহ্ (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত}**

উহুদের যুদ্ধে মহানবী (সা.) আহত হলে তাঁর ক্ষতস্থান ধৌত করার সৌভাগ্যও হযরত সালেম (রা.) লাভ করেন। কাতাদাহ্ (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, উহুদের যুদ্ধের দিন মহানবী (সা.) তাঁর ললাট এবং (ছেদন দন্ত আর সম্মুখ দাঁতের মধ্যবর্তী) দাঁতে আঘাত পান। তখন আবু হুযায়ফাহ্ (রা.)'র মুক্ত ক্রীতদাস হযরত সালেম মহানবী (সা.)-এর ক্ষতস্থান ধৌত করছিলেন আর মহানবী (সা.) বলছিলেন, সেই জাতি কীভাবে সফল হতে পারে যারা তাদের নবীর সাথে এরূপ আচরণ করেছে। তখন আল্লাহ্ তা'লা এই আয়াত অবতীর্ণ করেন,

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ (সূরা আলে ইমরানঃ ১২৯)

অর্থাৎ, এ বিষয়ে তোমার কোন কর্তৃত্ব নেই যে, তিনি তাদের তওবা গ্রহণ করত তাদের ক্ষমা করবেন নাকি শাস্তি দিবেন, তারা নিশ্চিতরূপে সীমালঙ্ঘনকারী। **(আত্ তাবাকাতুল কুবরা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৫, মাল কুতিলা মিনাল মুসলিমীন ইয়াওমে উহুদ, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত)**

এটি মনোযোগ সহকারে শোনার মতো একটি কথা, হযরত সালেম (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, কিয়ামত দিবসে এমন এক জাতিকে উপস্থিত করা হবে যাদের পুণ্য তাহামাহ্ পর্বতের সমান। (তাহামাহ্ আরব উপকূলের একটি নিম্নাঞ্চলের নাম যা সীনাই পর্বত থেকে আরম্ভ হয়ে আরবের দক্ষিণ-পশ্চিম পর্যন্ত বিস্তৃত। তাহামাহ্ একটি পর্বতশ্রেণি যা লোহিত সাগর থেকে আরম্ভ হয়। তাই বলেন, তাদের পুণ্যও তাহামাহ্'র পাহাড়পর্বত) সম হবে। কিন্তু তা যখন উপস্থাপন করা হবে তখন আল্লাহ্ তা'লা তাদের সকল পুণ্য বিনষ্ট করে দিবেন। আর এরপর তাদেরকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করবেন। তখন হযরত সালেম (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমার পিতামাতা আপনার জন্য নিবেদিত, আমাদেরকে এমন লোকের লক্ষণবলী বলুন যেন আমরা তাদেরকে চিনতে পারি। সেই সত্তার কসম! যিনি আপনাকে সত্য সহ প্রেরণ করেছেন, আমার আশঙ্কা হয়, পাছে কোথাও আমি আবার তাদের মতো না হয়ে যাই। মহানবী (সা.) বলেন, (এটি মনোযোগ সহকারে শোনার মতো কথা, তারা এমন মানুষ হবে) যারা হয়ত রোযাও রাখতো, নামাযও পড়তো, আর রাতে খুব কমই ঘুমাতো অর্থাৎ নফল পড়তো, কিন্তু তাদের সামনে যখনই কোন অবৈধ জিনিস উপস্থাপন করা হবে তারা তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। অর্থাৎ সেসব পুণ্য সত্ত্বেও তারা জাগতিক লোভ-লালসার শিকার হবে আর হারাম ও হালালের মাঝে পার্থক্য করবে না। এ কারণে আল্লাহ্ তা'লা তাদের কর্ম বিনষ্ট করবেন। **(উর্দূ দায়েরা মা'আরেফ ইসলামীয়্যাহ্, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৮৫১, যেরে লফয তাহামাহ্, পাঞ্জাব প্রদেশের লাহোরস্থ দানেশগাহ্ থেকে ২০০৫ সালে প্রকাশিত),{মা'রেফাতুস সাহাবাহ্ লি-আবী নাঈম, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৮৩, সালেম মওলা আবী হুযায়ফাহ্ (রা.), হাদীস নংঃ ৩৪৫৬, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০২ সালে প্রকাশিত}**

হযরত সওবান (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) বলেছেন, আমি আমার উম্মতের এমন কিছু লোক সম্পর্কে জানি যারা কিয়ামত দিবসে তাহামাহ্‌র পর্বতসম উজ্জ্বল পুণ্যরাজি সাথে নিয়ে উপস্থিত হবে। কিন্তু মহাসম্মানিত ও প্রতাপান্বিত আল্লাহ্ সেগুলোকে গুরুত্বহীন বা মূল্যহীন আখ্যা দিয়ে বাতাসে উড়িয়ে দিবেন। এ সম্পর্কে আরেকজন বর্ণনাকারীর বিবরণ রয়েছে। সওবান (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) তাদের কোন

লক্ষণ আমাদেরকে বলে দিন, তাদের সম্পর্কে আমাদেরকে স্পষ্ট করে বলুন, যেন আমরা অজ্ঞাতে তাদের মতো না হয়ে যাই। মহানবী (সা.) বলেন, তারা তোমাদেরই ভাই। তারা তোমাদেরই বর্ণের অর্থাৎ তোমাদেরই সমশ্রেণির মানুষ। আর রাতের বেলায় ইবাদত ইত্যাদির জন্য সেভাবেই সময় ব্যয় করে যেমনটি তোমরা করে থাক। অর্থাৎ ইবাদতকারীও হবে। কিন্তু তারা এমন মানুষ, যখন আল্লাহ্ কর্তৃক সম্মানিত বিষয়াদির সম্মুখীন হয় তখন সেগুলোর প্রতি অসম্মানজনক ব্যবহার করে বা এর সম্মানকে পদদলিত করে। **(সুনান ইবনে মাজাহ্, কিতাবুয্ যুহ্দ, বাব যিকরুয্ যনূব, হাদীস নং: ৪২৪৫)**

যেসব বিষয় আল্লাহ্ তা'লা নিষেধ করেছেন, হারাম আখ্যা দিয়েছেন, (সে সম্পর্কে) তাদের এই অনুভূতিই থাকে না যে, কোনটি বৈধ আর কোনটি অবৈধ। আর এরপর জাগতিকতা তাদের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে। অতএব এটি চিরন্তন চিন্তা ও ভয়ের একটি স্থান। আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে সর্বদা নিজেদের আত্মপর্যালোচনা করার তৌফিক দান করুন।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.)'র পুত্রদের নাম ছিল সালেম, ওয়াকেদ আর আব্দুল্লাহ্। যা কতিপয় জ্যেষ্ঠ সাহাবীর নামে তিনি রেখেছিলেন। তাদের একজনের নাম সালেমও ছিল যা আবু হুযায়ফাহ্ (রা.)'র মুক্ত ক্রীতদাস সালেমের নামে রাখা হয়েছিল। সাঈদ বিন আল্মুসাইয়্যেব বর্ণনা করেন, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.) আমাকে বলেন, তুমি কি জান আমি আমার পুত্রের নাম সালেম কেন রেখেছি? তিনি বলেন, আমি বললাম, আমি জানি না। তখন তিনি বলেন, আমি আমার পুত্রের নাম আবু হুযায়ফাহ্ (রা.)'র মুক্ত ক্রীতদাস হযরত সালেম (রা.)'র নাম অনুযায়ী সালেম রেখেছি। পুনরায় তিনি বলেন, তুমি কি জান আমি পুত্রের নাম ওয়াকেদ কেন রেখেছি। আমি বললাম, না, জানি না। তখন তিনি বলেন, হযরত ওয়াকেদ বিন আব্দুল্লাহ্ ইয়ারবুঈ (রা.)'র নামে এই নাম রেখেছি। এরপর জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি জান আমি আমার পুত্রের নাম আব্দুল্লাহ্ কেন রেখেছি। যখন আমি বললাম, জানি না। তখন তিনি বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহাহ্ (রা.)'র নামে আব্দুল্লাহ্ রেখেছি। **(আত্ তাবাকাতুল কুবরা, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১১৯, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত)**

জ্যেষ্ঠ সাহাবীদের তিনি অনেক সম্মান করতেন আর কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে প্রবীণ বুযূর্গদের নামে নিজের সন্তানদের নাম রাখতেন। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, এক যুদ্ধে আমরা মহানবী (সা.)-এর সাথে ছিলাম। কিছু লোক ঘাবড়ে গিয়েছিল। প্রচণ্ড যুদ্ধ আরম্ভ হলে কয়েকজন ঘাবড়ে যায়। তিনি বলেন, আমি আমার অস্ত্র নিয়ে বের হলে হযরত আবু হুযায়ফাহ্ (রা.)'র মুক্ত ক্রীতদাস হযরত সালেম (রা.)'র প্রতি আমার দৃষ্টি পড়ে। তার কাছেও তার অস্ত্রশস্ত্র ছিল, (তার) চেহারা ছিল গাম্ভীর্যপূর্ণ এবং প্রশান্ত, কোন ভয়ভীতি ছিল না এবং তিনি এগিয়ে যাচ্ছিলেন। আমি এই পুণ্যবানের পদাঙ্ক অনুসরণ করার সংকল্প করি। এক পর্যায়ে আমরা মহানবী (সা.)-এর সমীপে পৌঁছি এবং তাঁর কাছে বসে পড়ি। মহানবী (সা.) অপ্রসন্নচিত্তে বের হন এবং বলেন, হে লোকসকল! এই শংকা ও ভয়ভীতির কারণ কী? এই দু'জন মু'মিন যে দৃঢ়চিত্ততা প্রদর্শন করেছে তোমরা কি তা-ও প্রদর্শন করতে পারলে না! তোমরাও (তা) দেখাও। **(আত্ তারীখুল কবীর, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ১২৭, বাবুল আঈন, হাদীস নং: ৮৫৩৮, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০১ সালে প্রকাশিত)** কোন ভয় পাওয়া উচিত নয়, যেমনটি হযরত সালেম এবং তার এই সঙ্গী ছিলেন, যারা অঙ্গীকার করেছেন এবং সর্বপ্রকার ভয়ভীতির ঊর্ধ্বে থেকে এই কঠিন সময়েও অবিচল ছিলেন।

ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন, মক্কা বিজয়ের ঘটনার পর মহানবী (সা.) মক্কার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলোতে ছোট ছোট সৈন্যদল প্রেরণ করেন যেন তারা এসব গোত্রকে ইসলামের দিকে আহ্বান করতে পারে। কিন্তু তিনি এসব সৈন্যদলকে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেন নি। (কেবলমাত্র) তবলীগের উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছিলেন আর বলেছিলেন, যুদ্ধ করবে না। মহানবী (সা.) হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ (রা.)-কে বনু জাযীমাহ্ গোত্রের কাছে ইসলামের তবলীগের জন্য প্রেরণ করেন। হযরত খালেদ (রা.)-কে দেখামাত্রই তারা অস্ত্র ধারণ করে। হযরত খালেদ (রা.) তাদেরকে বলেন, মানুষ মুসলমান হয়ে গেছে তাই এখন আর অস্ত্র হাতে নেয়ার প্রয়োজন নেই। তাদের মাঝে এক ব্যক্তি জাহদাম বলে, আমি কোনভাবেই অস্ত্র সমর্পণ করবো না। (কেননা) ইনি খালেদ, আমি তাকে বিশ্বাস করি না। খোদার কসম! অস্ত্র সমর্পণ করার পর আমাদের বন্দি হতে হবে আর বন্দি হওয়ার পর শিরোচ্ছেদ করা হবে। তার জাতির কয়েকজন তাকে পাকড়াও করে এবং বলে, হে জাহদাম! তুমি কি চাও, আমাদের রক্ত প্রবাহিত করা হোক। নিশ্চয় মানুষ অস্ত্র সমর্পণ করেছে আর যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। এরপর তারা তার কাছ থেকে অস্ত্র ছিনিয়ে নেয় এবং সে-ও অস্ত্র সমর্পণ করে। এরপর হযরত খালেদ (রা.) তাদের কতককে হত্যা করেন আর কতককে বন্দি করেন। আর আমাদের প্রত্যেকের হাতে তাদের নিজ নিজ বন্দিকে তুলে দেন। আর পরের দিন এই নির্দেশ দেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তি যেন নিজের বন্দিকে হত্যা করে। আবু হুযায়ফাহ্ (রা.)'র মুক্ত ক্রীতদাস হযরত সালেম (রা.) বলেন, খোদার কসম! আমি আমার বন্দিকে আদৌ হত্যা করবো না। আর আমার কোন সাথিও এমনটি করবে না।

ইবনে হিশাম বলেন, তাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি বেরিয়ে মহানবী (সা.)-এর কাছে আসে আর পুরো ঘটনা বিবৃত করে। তিনি (সা.) জিজ্ঞেস করেন, খালেদের এমন কর্মকে কেউ অপছন্দ করেছে কি? অর্থাৎ মহানবী (সা.) এই কাজকে অপছন্দ করেছেন। তিনি (সা.) প্রশ্ন করলে তারা নিবেদন করে, জি হ্যাঁ, মধ্যম আকৃতির এক শেতাঙ্গ ব্যক্তি তার অপছন্দ ব্যক্ত করেছিল। খালেদ তাকে ধমক দিলে তিনি নীরব হয়ে যান। এছাড়া দীর্ঘকায় অপর এক ব্যক্তি এই কাজকে অপছন্দ করলে খালেদ তার সাথেও ঝগড়া করেন। তাদের মাঝে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়ও হয়। তখন হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) আমি তাদের উভয়কে চিনি। একজন হল, আমার পুত্র আব্দুল্লাহ্ আর অপরজন হল, আবু হুযায়ফাহ্‌র মুক্ত ক্রীতদাস হযরত সালেম। ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন, এরপর মহানবী (সা.) হযরত আলী (রা.)-কে ডেকে বলেন, তাদের কাছে যাও আর বিষয়টি দেখ যে, কী হয়েছে? এমনটি কেন হয়েছে? আর অজ্ঞতাপ্রসূত বিষয়টিকে নিজ পদতলে পিষ্ট কর। এটি একান্ত অজ্ঞতাপ্রসূত একটি কাজ হয়েছে, এটিকে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন করে দাও। অতএব হযরত আলী (রা.) সেই সম্পদ নিয়ে অগ্রসর হন যা মহানবী (সা.) তাকে দিয়েছিলেন। তিনি (সা.) হযরত আলী (রা.)-কে শুধু খালি হাতে পাঠান নি বরং অনেক ধনসম্পদসহ প্রেরণ করেছেন। আর তাদের প্রাণ ও সম্পদের যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তিনি তার রক্তপণ পরিশোধ করেন। অর্থাৎ অন্যায়ভাবে প্রাণ ও সম্পদের যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তার রক্তপণ পরিশোধের জন্য সেই সম্পদ পাঠিয়েছেন। এরপরও হযরত আলী (রা.)'র কাছে কিছু সম্পদ অবশিষ্ট থেকে যায়। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, এমন কেউ বাকি আছে কি যার সম্পদের ক্ষতিপূরণ ও প্রাণের রক্তপণ পরিশোধ হয় নি? তারা বলে, না, ন্যায়সঙ্গতভাবে সবকিছু পরিশোধ করা হয়েছে, কোন কিছু বাকী নেই। হযরত আলী (রা.) বলেন, আমি তা সত্ত্বেও

সেই সাবধানতার অধীনে যা মহানবী (সা.) অবলম্বন করেন, এই সম্পদ তোমাদের হাতে তুলে দিচ্ছি কেননা, তিনি যা জানেন তা তোমরা জান না। তিনি এই সম্পদ তাদের হাতে তুলে দেয়ার পর মহানবী (সা.)-এর সমীপে ফিরে আসেন এবং তাঁকে তা অবহিত করেন যে, আমি এভাবে কাজ সমাধা করে এসেছি। মহানবী (সা.) বলেন, তুমি সুচারুরূপে সেই কাজ সম্পন্ন করেছ। এরপর তিনি ক্বিবলামুখী হয়ে দু'হাত তুলে তিনবার এই দোয়া করেন, اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَبْرَأُ اِلَیْکَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدُ ابْنُ الْوَلِیْدِ অর্থাৎ **হে আল্লাহ্! খালেদ বিন ওয়ালীদ যা করেছে সে বিষয়ে আমি তোমার দরবারে দায়মুক্তির ঘোষণা দিচ্ছি**। **(সীরাত ইবনে হিশাম, পৃঃ ৫৫৭-৫৫৮, বাব মসীর খালেদ বিন ওয়ালীদ বা'দাল ফাতহ্ ইলা বানী জুযায়মাহ্... বৈরুতের দ্বার ইবনে হাযম থেকে ২০০৯ সালে প্রকাশিত), {সহীহ্ আল্ বুখারী কিতাবুল মাগাযী, বাব বা'সুন্ নবী (সা.) খালেদ বিন ওয়ালীদ ইলা বানী জুযায়মাহ্, হাদীস নংঃ ৪৩৩৯}**

এটি অনেক বড় ভুল কাজ হয়েছে। অতএব কোন আপনজনও যদি অন্যায় করে অথবা ভুল করে তাহলে মহানবী (সা.) শুধু তার প্রতি অসন্তোষই প্রকাশ করেন নি, বরং এর ক্ষতিপূরণও দিয়েছেন। তাদের রক্তপণও পরিশোধ করেছেন। আর নির্যাতিতদের মানসিক প্রশান্তির ব্যবস্থা করারও সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন। যদিও তারা শত্রু ছিল, যাদের কতক অস্ত্রও হাতে নিয়েছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও যা হয়েছে তা তিনি (সা.) পছন্দ করেন নি। এই ছিল তাঁর (সা.) ন্যায়বিচারের মান।

ইব্রাহীম বিন হানযালা নিজ পিতার পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন, ইয়ামামার যুদ্ধের দিন আবু হুযায়ফাহ্র মুক্ত ক্রীতদাস হযরত সালেম (রা.)-কে বলা হয়, আপনি পতাকার সুরক্ষা করুন। অথচ কেউ কেউ বলেছিল, আমরা আপনার জীবনের বিষয়ে শঙ্কিত। তাই আমরা আপনার পরিবর্তে অন্য কারো হাতে পতাকা ন্যস্ত করছি। তখন হযরত সালেম (রা.) বলেন, আমি কুরআন শরীফের গভীর জ্ঞান রাখি। আর এই জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও যদি আমি এর ওপর আমলকারী না হই তাহলে এটি খুবই মন্দ কথা, অথবা যদি প্রাণের ভয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব আর পবিত্র কুরআনের নির্দেশ পালন না করি তাহলে কুরআনের এমন জ্ঞান থেকে আমার লাভ কী? যাহোক, লড়াইয়ের সময় যখন তার ডান হাত কাটা পড়ে তখন তিনি নিজের বাম হাতে পতাকা ধরে রাখেন। আর যখন বাম হাতও কাটা পড়ে তখন পতাকাকে ঘাড়ের সাথে আটকে রাখেন। আর এই বাক্য পড়তে থাকেন, وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ (সূরা আলে ইমরানঃ ১৪৫) এবং وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ (সূরা আলে ইমরানঃ ১৪৭) অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা.) কেবল আল্লাহ্ তা'লার একজন রসূল। আর কতই না এমন নবী ছিলেন যাদের সহযোদ্ধা হিসেবে অনেক খোদাপ্রেমিক লোকেরা যুদ্ধ করেছে। হযরত সালেম (রা.) যখন পড়ে যান তখন সাথিদের জিজ্ঞেস করেন, আবু হুযায়ফাহ্র কী অবস্থা? লোকেরা উত্তর দেয়, তিনি শহীদ হয়ে গেছেন। এরপর আরেকজনের নাম নিয়ে জিজ্ঞেস করেন, সে কী করেছে। তখন উত্তর আসে, তিনিও শহীদ হয়ে গেছেন। তখন হযরত সালেম (রা.) বলেন, আমাকে তাদের দু'জনের মাঝে শুইয়ে দাও। তিনি শাহাদত বরণ করলে হযরত উমর (রা.) তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি সুবায়তা বিন ইয়ায়্যার এর কাছে প্রেরণ করেন। (কেননা) তিনি হযরত সালেমকে মুক্ত করেছিলেন। কিন্তু তিনি এই পরিত্যক্ত সম্পত্তি গ্রহণ করেন নি এবং বলেন, আমি তাকে **সায়েবাহ্** হিসেবে অর্থাৎ শুধুমাত্র খোদার খাতিরে স্বত্বহীনভাবে মুক্ত করেছিলাম। এরপর হযরত উমর (রা.) তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি বায়তুল মালে জমা করে দেন। **{উসদুল গাবাহ্, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৮৪, সালেম মওলা আবী হুযায়ফাহ্ (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত}**

মুহাম্মদ বিন সাবেত (রা.) বর্ণনা করেন, ইয়ামামা'র যুদ্ধে মুসলমানরা যখন ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে তখন হযরত সালেম (রা.) বলেন, আমরা মহানবী (সা.)-এর সাথে এমন করতাম না, অর্থাৎ পলায়ন করতাম না। তিনি নিজের জন্য একটি গর্ত খুঁড়েন, আর সেখানে দাঁড়িয়ে যান, সেদিন তার কাছে মুহাজিরদের পতাকা ছিল। অতঃপর তিনি বীরত্বের সাথে লড়াই করতে করতে শহীদ হন। দ্বাদশ হিজরীতে হযরত আবু বকর (রা.)'র খিলাফতকালে সংঘটিত ইয়ামামা'র যুদ্ধে তিনি শহীদ হন। এই উদ্ধৃতিটি তাবাকাতুল কুবরা'র। **{আত্ তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৬৪-৬৫, সালেম মওলা আবী হুযায়ফাহ্ (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত}**

হযরত যায়েদ বিন সাবেত (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হযরত সালেম (রা.) যখন শহীদ হন তখন মানুষ বলতো, কুরআনের এক চতুর্থাংশ যেন চলে গেল। **{আল্ মুসতাদরাক আলাস্ সহীহাঈন, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৫১-২৫২, কিতাব মা'রেফাতুস সাহাবাহ্, বাব যিকরু মানাকেব সালেম মওলা আবী হুযায়ফাহ্, হাদীস নংঃ ৫০০৪, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০২ সালে প্রকাশিত}** অর্থাৎ মহানবী (সা.) যে চারজন আলেমের নাম নিয়েছিলেন যে, তাদের কাছে কুরআন শিখ, তাদের একজন চলে গেছেন।

পরবর্তী যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তার নাম হল, হযরত ইতবান বিন মালেক (রা.)। তিনি খাযরাজ গোত্রের বনু সালেম বিন অওফ শাখার সদস্য ছিলেন। মহানবী (সা.) তার এবং হযরত উমর (রা.)'র মাঝে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন রচনা করেছিলেন। তিনি বদর, উহুদ ও খন্দকের যুদ্ধে অংশ নেন। মহানবী (সা.)-এর জীবদ্দশায় তার দৃষ্টিশক্তি ক্রমশ লোপ পেতে থাকে। হযরত মুয়াবিয়া (রা.)'র শাসনকালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। **{আত্ তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪১৫-৪১৬, ইতবান বিন মালেক (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত}**

মহানবী (সা.) যখন মদীনায় আগমন করেন তখন হযরত ইতবান বিন মালেক (রা.) তার সঙ্গীদের সাথে নিয়ে এগিয়ে যান আর তাঁর (সা.) সমীপে তাদের বাড়িতে অবস্থান করার অনুরোধ করেন। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, আমার উষ্ট্রীকে ছেড়ে দাও, এটি এখন প্রত্যাদিষ্ট, অর্থাৎ যেখানে খোদা চাইবেন, এটি নিজেই (সেখানে) বসে পড়বে। **(সীরাত ইবনে হিশাম, পৃঃ ২২৮-২২৯, এ'তেরাযুল কাবায়েল লাহু তাবগী নুযূলাহু ইনদাহা, বৈরুতের দ্বার ইবনে হাযম থেকে ২০০৯ সালে প্রকাশিত), (হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এম, এ প্রণীত সীরাত খাতামান্ নবীঈন, পৃঃ ২৬৭-২৬৮ দ্রষ্টব্য)**

হযরত উমর (রা.) বর্ণনা করেন, আমি এবং আনসারদের মধ্যে থেকে আমার এক প্রতিবেশী **'বনু উমাইয়্যাহ্ বিন যায়েদ'** এ বসবাস করতাম ('বনু উমাইয়্যাহ্ বিন যায়েদ' একটি গ্রামের নাম)। এটি মদীনার সেসব গ্রামের অন্তর্ভুক্ত যা মদীনার আশেপাশের উঁচু জায়গায় অবস্থিত ছিল। আমরা পালাক্রমে মহানবী (সা.)-এর কাছে যেতাম। একদিন সে যেতো আরেকদিন আমি যেতাম। আমি যখন যেতাম তখন সেদিনের ওহী ইত্যাদির সংবাদ আমি তার কাছে নিয়ে আসতাম আর সে যখন যেত তখন সেও এমনটিই করতো। তিনি বলেন, একবার আমার আনসারী সাথী নিজের পালায় যায় এবং ফিরে এসে সজোরে আমার দরজায় কড়াঘাত করে আর আমার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে, উনি এখানে আছেন কি? তখন আমি বিচলিত হয়ে বাইরে বের হলে তিনি বলেন, অনেক বড় দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। হযরত উমর (রা.) বলেন, একথা শুনে আমি হাফসা (রা.)'র কাছে গিয়ে দেখতে পাই সে কাঁদছে। আমি জিজ্ঞেস করি, মহানবী (সা.) কি তোমাকে তালাক দিয়ে দিয়েছেন? তিনি বলেন, আমি জানি না। এরপর আমি মহানবী (সা.)-এর কাছে যাই এবং আমি দাঁড়ানো অবস্থায়ই জিজ্ঞেস

করি, আপনি কি (আপনার) সহধর্মিণীদের তালাক দিয়ে দিয়েছেন? তিনি (সা.) বলেন, না; তখন আমি বলি, আল্লাহু আকবর। **(সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল ইলম, বাবু তানাওব ফিল ইলম, হাদীস নং: ৮৯)**

রেওয়ায়েত অনুসারে বিভিন্ন স্থানে বিশদ বিবরণও পাওয়া যায়। এটি একটি দীর্ঘ বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ এক মাসের জন্য মহানবী (সা.) স্বয়ং নিজেকে পৃথক করে নেন, শুধু স্ত্রীদের কাছ থেকেই নয়, বরং সাহাবীদের থেকেও পৃথক হয়ে গিয়েছিলেন। এ কারণে এই ধারণা জন্মে যে, তিনি (সা.) কোন কারণে অসন্তুষ্ট হয়ে (স্ত্রীদের) তালাক দিয়ে দিয়েছেন। যাহোক, কারণ যা-ই থাকুক না কেন, এটি আসল কারণ নয়, কোন ভিন্ন কারণ ছিল।

হযরত সৈয়দ যয়নুল আবেদীন ওলী উল্লাহ্ শাহ্ সাহেব বুখারী শরীফের ব্যাখ্যায় লিখেন, হযরত উমর (রা.) বলেছেন, একদিন আমি যেতাম আরেকদিন আমার অপর সঙ্গী যেত; তা থেকে বুঝা যায়, "কেউ যদি জ্ঞান অর্জনের জন্য পুরো সময় বা ফুরসৎ না পায় তাহলে কারো সাথে পালা নির্ধারণ করে (জ্ঞান অর্জনের জন্য) যেতে পারে। যেমনটি হযরত উমর (রা.) হযরত ইতবান বিন মালেক আনসারী (রা.)'র সাথে পালা নির্ধারণ করেছিলেন। এ (ঘটনা) থেকে সাহাবীদের আগ্রহ বা শখ সম্পর্কেও অবহিত হওয়া যায় যে, কাজকর্ম ছেড়ে তিন-চার মাইল দূর থেকে এসে গোটা দিন এ কাজে ব্যয় করতেন।" **(সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল ইলম, বাবু তানাওব ফিল ইলম, হাদীস নং: ৮৯, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৬৫, রাবওয়ার নাযারাতে এশায়াত কর্তৃক প্রকাশিত)**

কিন্তু আল্লামা আঈনী বুখারীর ভাষ্য উমদাতুল ক্বারী'তে লিখেছেন, বলা হয়, প্রতিবেশী ছিলেন হযরত ইতবান বিন মালেক (রা.) কিন্তু প্রকৃত বিষয় হল, হযরত উমর (রা.)'র প্রতিবেশী ছিলেন, অওস বিন খাওয়ালী। **(উমদাতুল ক্বারী, ২০তম খণ্ড, পৃ: ২৫৬, কিতাবুন্ নিকাহ্, বাব মওয়েযাতুর্ রাজুলি ইবনাতুহু বিহালে যাওজিহা, হাদীস নং: ৫১৯১, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০১ সালে প্রকাশিত)**

যাহোক, হযরত উমর (রা.) তার রেওয়ায়েতে একথাই বর্ণনা করেছেন।

একটি বর্ণনায় এসেছে, যখন হযরত ইতবান বিন মালেক (রা.)'র দৃষ্টিশক্তি লোপ পেলে তিনি মহানবী (সা.)-এর কাছে বাজামা'ত নামাযে যোগদান না করার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করেন, আমি মসজিদে আসতে অপারগ, তাই অনুমতি দেওয়া হোক। মহানবী (সা.) বলেন, তুমি কি আযানের ধ্বনি শুনতে পাও? হযরত ইতবান (রা.) বলেন, জ্বি। তখন মহানবী (সা.) তাকে এর অনুমতি প্রদান করেন নি। এটি প্রসিদ্ধ হাদীস, অধিকাংশ সময় উপস্থাপন করা হয়। কিন্তু এর কিছুটা বিশদ বিবরণও রয়েছে। সহীহ্ বুখারীর বর্ণনা থেকে জানা যায়, পরবর্তীতে মহানবী (সা.) হযরত ইতবান (রা.)-কে বাড়িতে নামায পড়ার অনুমতি প্রদান করেছিলেন। প্রথমে নিষেধ করেছিলেন কিন্তু পরে অনুমতি প্রদান করেন। যেমন, বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে, হযরত ইতবান বিন মালেক (রা.) স্বীয় গোত্রে ইমামের দায়িত্ব পালন করতেন এবং তিনি অন্ধ ছিলেন। তিনি মহানবী (সা.)-কে বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! অন্ধকার ও বন্যা দেখা দেয়, অনেক সময় প্রবল বৃষ্টিপাত হয়, অন্ধকার হয়ে যায়, নীচের উপত্যকায় পানি বইতে থাকে, আমি অন্ধ; তাই হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমার বাড়িতে এসে নামায পড়ুন, একে আমি নামায সেন্টার বানাবো। {হযরত ইতবান (রা.)} একদিন এসে বলেন, এখানে আসা আমার জন্য কষ্টসাধ্য, তাই আপনি আমার বাড়িতে আসুন আর আমার বাড়িতে আমি একটি জায়গা নির্ধারণ করেছি, সেখানে আপনি নামায পড়ুন। তখন মহানবী (সা.) তার বাড়িতে আসেন এবং জিজ্ঞেস করেন, তুমি কোথায় আমার নামায পড়া পছন্দ করবে? তিনি ঘরের একদিকে ইঙ্গিত করেন আর মহানবী (সা.) সেই স্থানে নামায পড়েন। {আত্ তাবাকাতুল

কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪১৫, ইতবান বিন মালেক (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত}, (সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল আযান, বাব আর্‌রুখসাতু ফিল মাতারে ওয়াল ইল্লাতে আইয়্যুসাল্লী ফী রাহলিহী, হাদীস নংঃ ৬৬৭)

অতএব, বিশেষ পরিস্থিতিতে বাড়িতে নামায পড়ার অনুমতি দিলেও অন্যান্য বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হয়, লোকদেরকে সেখানে একত্র করে তিনি নামায পড়াতেন। কেননা বৈরী আবহাওয়া এবং পথের প্রতিবন্ধকতার কারণে মানুষ মসজিদে যেতে পারতো না। কাজেই, অজুহাত দেখানোর কোন সুযোগ নেই। পরবর্তীতে (বাড়িতে নামায পড়ার) অনুমতি দিলেও ঘরের এক অংশে বাজামা'ত নামায পড়ার শর্তসাপেক্ষে দিয়েছেন। যেমন একথার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হযরত সৈয়্যদ ওলী উল্লাহ্ শাহ্ সাহেব সহীহ্ বুখারীর কিতাবুল আযানের অধ্যায়, **'আর্‌রুখসাতু ফিল মাতারে ওয়াল ইল্লাতে আইয়্যুসাল্লী ফী রাহলিহী'** অর্থাৎ বৃষ্টি অথবা অন্য কোন কারণে নিজ নিজ নিবাসে নামায পড়ার অনুমতির ব্যাখ্যায় লিখেন, ইমাম সাহেব {অর্থাৎ ইমাম বুখারী (রহ.)} অপারগতার সেই অবস্থা তুলে ধরছেন যাতে বাজামা'ত নামায পড়ার ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী ছাড় দেয়ার কথা রয়েছে, কিন্তু মহানবী (সা.) তাকেও বাড়িতে একা (নামায) পড়ার অনুমতি দেন নি, (অর্থাৎ বাড়িতে একা নামায পড়ে নিও মর্মে অনুমতি প্রদান করেন নি)। অথচ মহানবী (সা.) সর্বদা যতদূর সম্ভব শরীয়তের শিক্ষা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সহজসাধ্যতার বিষয়টি দৃষ্টিগোচর রাখতেন। ধর্মীয় বিষয়ে যেখানে ছাড় দেয়া সম্ভব হতো তিনি সহজসাধ্যতা সৃষ্টি করা পছন্দ করতেন, কিন্তু তিনি তাকে {অর্থাৎ হযরত ইতবান (রা.)-কে} একা নামায পড়ার অনুমতি দেন নি। আর অনুমতি দিলেও বাজামা'ত পড়ার শর্তে দিয়েছেন।

এরপর লিখেন, হযরত ইতবান (রা.) অন্ধ ছিলেন। পথিমধ্যে নালা-নর্দমা ছিল, এছাড়া অন্যান্য বর্ণনায় এসেছে, তিনি বাড়িতে নামায পড়ার অনুমতি প্রার্থনা করলে তিনি (সা.) তাকে অনুমতি প্রদান করেন কিন্তু বাজামা'ত নামায পড়ার শর্তে। তিনি (সা.) বলেন, যদি বাজামা'ত নামায পড় তাহলে অনুমতি আছে। এরপর তিনি (রা.) লিখেন, ফরয নামায একা পড়ার নিয়ম থাকলে তিনি (সা.) হযরত ইতবান (রা.)-কে অক্ষম জ্ঞান করে বাড়িতে একা নামায পড়ার অনুমতি অবশ্যই দিতেন। **(সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল আযান, বাব আর্‌রুখসাতু ফিল মাতারে ওয়াল ইল্লাতে আইয়্যুসাল্লী ফী রাহলিহী, হাদীস নংঃ ৬৬৭)**

কাজেই, এ বিষয়টি সদা স্মরণ রাখা উচিত, এখানে (অর্থাৎ ইংল্যান্ডেও) যদি দূরত্ব বেশি হয়, যানবাহন না থাকে, সময় না পাওয়া যায় তাহলে যেমনটি কয়েকবার বলেছি, আহমদীদের নিজেদের বাড়িতে নামায সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা উচিত আর প্রতিবেশীরা একত্রিত হয়ে সেখানে বাজামা'ত নামায পড়ুন। আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে এসব নির্দেশ মেনে চলার তৌফিক দিন।

এখন আমি কয়েকজন প্রয়াত ব্যক্তির স্মৃতিচারণ করব, এখন তাদের গায়েবানা জানাযা পড়া হবে। তাদের মধ্যে একজন হলেন, রাবওয়ার শ্রদ্ধেয় গোলাম মোস্তফা আওয়ান সাহেব। গত ১৬ই মার্চ, ৭৮ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি জন্মগত আহমদী ছিলেন। তার দাদা দেওয়ান বখ্‌শ সাহেবের মাধ্যমে তাদের পরিবারে আহমদীয়াত আসে। মরহুম নিয়মিত পাঁচবেলা নামায পড়তেন। তাহাজ্জুদ গোজার ছিলেন। খোদাভীরু, সহানুভূতিশীল, হিতৈষী, সচ্চরিত্রবান, মিশুক ও সহজ-সরল স্বভাবের অধিকারী ছিলেন। অনেক দোয়া করতেন। অতিথিসেবক ছিলেন। দরিদ্রদের সেবক ছিলেন। আত্মীয়দের সাথে সুসম্পর্ক রাখতেন। ধর্মকে পার্থিবতার ওপর প্রাধান্যদানকারী নেক ও নিষ্ঠাবান মানুষ ছিলেন। জামা'তের ব্যবস্থাপনা এবং খিলাফতের প্রতি গভীর ভালোবাসার

সম্পর্ক রাখতেন। চাকরীসূত্রে সৌদি আরবেও ছিলেন আর সেখানে অবস্থানকালে তিনি নয়বার বায়তুল্লায় হজ্জব্রত পালনের সৌভাগ্য লাভ করেন আর অগণিতবার উমরাহ্ করারও তৌফিক লাভ করেছেন। তিনি ক্বাবা গৃহ এবং মসজিদে নববীতে নির্মাণ কাজেরও তৌফিক লাভ করেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় মূসী ছিলেন। একদিন হঠাৎ তার শরীর খারাপ হলে প্রথমে তার এই চিন্তাই হয়েছিল যে, আমাকে হিস্যায়ে জায়েদাদ পরিশোধ করতে হবে। এরপর আল্লাহ্ তা'লা তাকে আরোগ্য দান করলে তিনি তৎক্ষণাৎ কোন সম্পত্তি বিক্রি করে নিজের হিস্যায়ে জায়েদাদ (অর্থাৎ সম্পত্তির ওসীয়্যতকৃত অংশ) পরিশোধ করেন। মরহুমের শোকসন্তপ্ত পরিবারে তার স্ত্রী ছাড়া একজন পুত্র সন্তান রয়েছে জার্মানিতে বসবাসকারী আহমদ মুর্তজা। চারজন কন্যা রয়েছে, দু'জন জামাতার একজন মুহাম্মদ জাভেদ সাহেব, জাম্বিয়া জামাতের মুবাল্লিগ আর অপরজন হলেন জামীল আহমদ তাবাস্সুম সাহেব, রাশিয়ার মুবাল্লিগ। তারা ওয়াকেফে যিন্দেগী হিসেবে সেখানে সেবা করার সুযোগ পাচ্ছেন। মরহুমের যে মেয়েদের এই মুবাল্লিগদের সাথে বিয়ে হয়েছে এবং নিজেদের ওয়াকেফে যিন্দেগী স্বামীর সাথে যারা বহির্বিশ্বে রয়েছেন, তারা বিদেশে থাকার কারণে পিতার মৃত্যুর সময় সেখানে যেতে পারেন নি আর প্রবাসেই তাদেরকে এই দুঃখ সহ্য করতে হয়েছে। আল্লাহ্ তাদেরকে ধৈর্য এবং সহনশীলতার সাথে (এই শোক) সইবার তৌফিক দিন এবং প্রয়াতের পদমর্যাদা উন্নীত করুন।

দ্বিতীয় জানাযা হল, কাঠগড়হীর মোহাম্মদ নওয়ায সাহেবের সহধর্মিণী শ্রদ্ধেয়া আমাতুল হাঈ সাহেবার। ১৫ই মার্চ তিনি মৃত্যু বরণ করেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তিনি কাদিয়ানের পার্শ্ববর্তী গ্রাম বাগোল নিবাসী ছিলেন। মাত্র দু'বছর বয়সে তিনি তার পিতাকে হারান এরপর তার বড় চাচা মোহাম্মদ ইব্রাহীম তাকে লালন-পালন করেন। মরহুমা জন্মগত আহমদী ছিলেন। ১৯০৩ সনে তার পরিবারে আহমদীয়াত এসেছিল আর পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তার চাচার পরিবারের সাথে হিজরত করে জাড়াওয়ালা'তে এসে তিনি বসতি স্থাপন করেন। এরপর ১৯৮১ সনে তিনি সন্তানদের শিক্ষা-দীক্ষার জন্য রাবওয়ায় স্থানান্তরিত হন আর শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত রাবওয়াতেই ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি মূসীয়া ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা তাকে ছয় পুত্র ও পাঁচ কন্যা দান করেছেন। তার এক মেয়ে অকালেই মারা গিয়েছিল। নিজের সন্তানদের মাধ্যমে ওয়াক্ফের সূচনা করেন এরপর প্রজন্মপরম্পরায় এই ধারা চলছে। মরহুমার বড় ছেলে রানা ফারুক আহমদ সাহেব নাযারাত দাওয়াত ইলাল্লাহ্'য় জামা'তের মুরব্বী হিসেবে কর্মরত আছেন। ছোট ছেলে হাফেয মাহমুদ আহমদ তাহের তাঞ্জানিয়ার জামেয়া আহমদীয়াতে শিক্ষক হিসেবে সেবারত আছেন। তিনি মায়ের জানাযায় অংশ নিতে পাকিস্তান যেতে পারেন নি। অনুরূপভাবে এক পৌত্রও জামা'তের মুবাল্লিগ। এক দৌহিত্র ঘানায় জামা'তের মুরব্বী হিসেবে কর্মরত আছে। এক পৌত্র ও পৌত্রী হাফেযে কুরআন। এছাড়া অনেক পৌত্রী ও দৌহিত্রীকে তিনি মুরব্বী ও ওয়াকেফে যিন্দেগীর সাথে বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন।

তার ছেলে হাফেয মাহমুদ বলেন, আমাদের পিতামাতা সারাজীবন জামা'তের সেবাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন আর আমাদেরকে জামা'তের ব্যবস্থাপনা এবং আহমদীয়া খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত রাখার এবং নিয়মিত বাজামা'ত নামাযে অভ্যস্ত করানোর জন্য সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকতেন। আহমদীয়াত-প্রচারেরও গভীর আগ্রহ ছিল। তার মায়ের সব ভাই-বোন অ-আহমদী ছিল। সাধ্যমত তাদেরকে তবলীগ করতেন। এই

তবলীগের ফলে তার এক সহোদর আব্দুল হামীদ সাহেবের আহমদীয়াত গ্রহণের সৌভাগ্য হয়, এখন তার সন্তানরাও আল্লাহ্‌র কৃপায় জামা'তের সেবক। যখন তিনি 'শোরকোট'এ ছিলেন, ৫৩ এবং ৭৪ সনে সেখানে জামা'ত অত্যন্ত কঠিন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়। পরম সাহসিকতা ও বীরত্বের সাথে তিনি এই সময় পার করেছেন আর কোন ধরনের ভয়কে কাছে ঘেঁষতে দেন নি। তিনি লিখেন, ৭৪ সালের হাঙ্গামার সময় একদিন গ্রাম্য মাতব্বরের স্ত্রী আমাদের বাড়িতে আসে আর গ্রাম্যপ্রধানের পক্ষ থেকে সংবাদ দেয়, আহমদীদের বাড়ি-ঘরে আক্রমণের জন্য মিছিল আসছে তাই বাড়ির পুরুষরা যেন বাইরে গিয়ে ক্ষেতের মধ্যে লুকিয়ে থাকে আর মহিলারা আমাদের বাড়িতে এসে আশ্রয় নেন। কিন্তু আমাদের মা উত্তর দেন, আমরা আমাদের বাড়িতেই থাকবো তা আমরা মরি বা বাঁচি। সে সময়ই একদিন তাদের বাড়িতে মিছিল আসে। তখন বাড়িতে কোন পুরুষ মানুষ ছিল না শুধুমাত্র বোনেরা এবং তার মা ছিলেন। তিনি বলেন, মিছিল আমাদের বাড়ির বাইরে ছিল, হাতে একটি কুঠার নিয়ে তিনি (অর্থাৎ মা) বাড়ির আঙিনায় পায়চারি করতে থাকেন। তখন বাইরে থেকে কেউ বলে উঠে, এদের বাড়িতে আক্রমণ কর। তখন ভেতর থেকে তিনি (অর্থাৎ মা) বলেন, কেউ যদি দেয়াল টপকে ভেতরে আসে তাহলে আমি তার মস্তক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলব আর সেভাবে করব যেভাবে হযরত সাফিয়াহ্ (রা.) মাথা কেটে বাইরে নিক্ষেপ করেছিলেন। যাহোক, এরূপ সাহস দেখে বিরোধীরা সেখান থেকে চলে যায়। ৭১ সালে সেনাবাহীনিতে কর্মরত তার এক পুত্র যুদ্ধবন্দি ছিলেন। সেনাবাহীনিতে ছিলেন বা সরকারী কর্মচারী ছিলেন, যাহোক যুদ্ধবন্দি ছিলেন। তিন বছর তিনি যুদ্ধবন্দি ছিলেন। অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে মা সেই সময় অতিবাহিত করেছেন আর ফিরে আসা মাত্রই তাকে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)'র সকাশে উপস্থিত করেন। তিনি বলেন, মহানবী (সা.)-এর প্রতি আমাদের মায়ের ঐকান্তিক ভালোবাসা ছিল আর সবসময় বাড়িতে আলোচনা হত এবং তিনি একথাই বলতেন, মহানবী (সা.)-এর ঘটনাবলী শোনাও। জীবন সায়াহ্নেও মহানবী (সা.) এবং মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কথা বলতেন যে, তাঁরা আসছেন। আল্লাহ্ তা'লা তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন, (তার প্রতি) ক্ষমার আচরণ করুন। আর তার সন্তান-সন্ততি এবং বংশধরদেরকেও তার পুণ্যসমূহ ধরে রাখার তৌফিক দান করুন। (আমীন)

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনুদিত)